প্রতিধ্বনি the Echo
Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed Indexed International Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: https://www.thecho.in
ISSN: 2278-5264 (Online)
ISSN: 2321-9319 (Print)

ঝুম্পা লাহিড়ীর ‘সমনামী’ : আত্মিক সংকটে জর্জরিত এক বাঙালি রমণীর জীবন পরিক্রমা

পরিমল চন্দ্র দাস

Abstract

*Jhumpa Lahiri is not a Bengali writer. After the grand success of the ‘**Pulitzer Prize**’ – Wining short story collection **‘Interpreter of Maladies’** she wrote her first novel ‘**The Namesake**’ (2003) in English from America. ‘**The Namesake’** was published in Bengali under the title ‘**Samanami**’. Ashima Bhaduri (Ganguli), the main character of the novel was born in Uttar-Kolkata; at the age of nineteen she got married with an NRI student named Ashoke Ganguli of ‘**Massachusetts Institutes of Technology**’. Ashima emigrates to the United States to from a new life. They spent couple of years in Boston. After two years, the Gangulis have moved from Harvard Square to a university town, which was on the outside of Boston. After two years in university housing Ashima and Ashoke decided to buy a home on Pemberton Road and there were no Bengali neighbors. New to America, Ashima could not adjust with the attitude towards life of the American people and culture. Every day, year after years she struggles through the language and different cultural barriers and feels a terrible anguish of alienation. This alienation of being a foreigner is compared to ‘**a sort of life long pregnancy**’. After sudden death of her husband Ashima feels deep loneliness. Her son Gogol is living in a tiny apartment in New York, working as an architect. Within a year of dating, Gogol and Moushumi get married in New Jersey. But, Moushumi has an affair, so they decided to get divorce within a year. Gogol’s sister Sonia and her boy-friend Ben are going to be married and they will form a new life separately. Ashimia decided to spend six months at a time in Kolkata with her brother’s family and six months in the United States with her children and friends. In this paper a discussion in made on the tragedy of Ashima which is emanating from root and rootlessness.*

Keywords: Emigrates, Language and Cultural barriers, Alienation, Rootlessness, and Nostalgic.

ঝুম্পা লাহিড়ী বাংলা ভাষার লেখিকা নন। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজিতে লেখা তাঁর প্রথম গল্পসংকলন ‘ইন্টারপ্রেটার অব ম্যালাডিজ’ নামে প্রকাশিত হয়। লেখিকার প্রথম উপন্যাস ‘দি নেমসেক’ (২০০৩)। ‘দি নেমসেক’-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ‘সমনামী’ নামে। ‘সমনামী’ এক স্বতন্ত্র অনুভবের কাহিনি। মূল উপন্যাসটির লেখিকা প্রবাসী বাঙালি আর উপন্যাসটির নায়িকা অসীমাও প্রবাসী। বলা যায়, ঔপন্যাসিক ঝুম্পা লাহিড়ীই যেন অসীমা চরিত্রের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। একদিকে দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের প্রতি প্রবল পিছুটান, অপরদিকে প্রবাস-জীবনকে মেনে নেওয়া বা মানিয়ে নেওয়ার আবর্তে পড়ে এক প্রবল

আত্মিক সঙ্কটে জর্জরিত হয়েছেন, মানসিকভাবে ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে গেছেন এই উপন্যাসের নায়িকা অসীমা। 'দেশ' পত্রিকায় পক্ষ থেকে নেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ঔপন্যাসিক ঝুম্পা লাহিড়ীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল - 'আমেরিকায় চলে যাওয়ার পর, আপনি যখন বিদেশে বড় হচ্ছেন, আপনার 'নেমসেক' বইতে এর কিছুটা উল্লেখ আছে, ব্যক্তিগতভাবে আপনি কখনও ফিল করেছেন 'দ্যাট, ইউ আর অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য রুটস, এখানেও না, ওখানেও না, এটা নিজে কখনও, কোনওভাবে ফিল করেছেন কি?' ...... উত্তরে ঝুম্পা জানিয়েছেন - 'এটা আমার জীবন। জন্ম থেকে শুরু করে যেদিন মারা যাব, সেদিন অবধি আমি এটা ফিল করব। ছোটবেলায় ভাল লাগত না এই ফিলিংটা। মনে হত, আমি কোনো জায়গায় মানুষ নই।'[১] বস্তুত, 'সমনামী' উপন্যাসে অসীমার অসহায় একাকিত্বের চিত্রণ হয়ে উঠেছে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।

'সমনামী' উপন্যাসটির ঘটনাকালের সূচনা ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ এবং সমাপ্তি ২০০০ খ্রিস্টাব্দ। সুদীর্ঘ বত্রিশ বছর সময় পরিধির মধ্যে অসীমার পরিবারে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনাবলী উপন্যাসটিতে স্থান পেয়েছে। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে বছর উনিশের মেয়ে অসীমার বিয়ে হয় আমেরিকায় ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে গবেষণারত অশোকগাঙ্গুলির সঙ্গে। উত্তর কলকাতার মেয়ে অসীমা স্বামীর সঙ্গে পাড়ি দেয় দূর প্রবাস আমেরিকায়। অসীমা আপাদমস্তক বাঙালি কন্যা; বিয়ের পর স্বামীর পদবি গ্রহণ করলেও বাঙালি নারীর স্বাভাবিক সংস্কারবশতঃ তিনি কখনও স্বামীর নাম উচ্চারণ করেন না। আমেরিকান মেয়ে বউদের মতো হাঁটু পর্যন্ত ঝুল গাউন পরা অসীমার কাছে বেশ অস্বস্তিকর। তিনি বরং মুর্শিদাবাদি সিল্কের শাড়িতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। আমেরিকানদের মতো চামড়া না ছাড়িয়ে মুরগির মাংস তিনি খেতে চান না। বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে সে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকতে চান এই দূর প্রবাসে গিয়েও ---

> অসীমা 'দেশ' পত্রিকার একটা বহুব্যবহারে জীর্ণ হয়ে যাওয়া কপি থেকে চোখ তুলল। 'দেশ' -এর এই সংখ্যাটা সে বস্টনে আসার সময় প্লেনে পড়বার জন্য এনেছিল। আজ পর্যন্ত প্রাণে ধরে সেটা ফেলে দিতে পারেনি। একটু খসখসে কাগজে ছাপা বাংলা অক্ষরগুলো তার কাছে চিরস্থায়ী আরাম আনে, সান্ত্বনা দেয়।[২]

প্রবাসী অশোকের সঙ্গে বিবাহের তাঁর আপত্তি না থাকলেও দূর প্রবাসে গিয়ে তিনি ভিন্ন আবহাওয়া ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারেননি। আত্মীয়স্বজন, পরিচিত পরিবেশ থেকে বিচ্ছেদ তাকে যন্ত্রণা দেয়। গর্ভে নতুন জীবনের অস্তিত্ব জানান দেবার পর থেকেই সেই যন্ত্রণা আরও প্রবল হয়ে ওঠে ---

> ডাক্তারের বলে দেওয়া প্রসবের দিনের দু'সপ্তাহ আগে এক চিটচিটে বিকেলে অসীমা গাঙ্গুলি তার সেন্ট্রাল স্কোয়ার অ্যাপার্টমেন্টের রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে একটা বাটিতে রাইস ক্রিস্পি, প্ল্যান্টার্স বাদাম আর কুচোনো লাল পেঁইয়াজ একসঙ্গে মাখছিল। তাতে নুন, লেবুর রস আর মিহি করে কাটা কাঁচালঙ্কা মেশাতেই একটু সরষের তেলের জন্য তার মনটা হাহাকার করে উঠল।[৩]

হাসপাতালে ভর্তি হবার পর ডাক্তারেরা স্বাভাবিক সন্তানজন্মই হবে বলে অসীমাকে আশ্বস্ত করলেও তাঁর কাছে কোনোকিছুই স্বাভাবিক ঠেকে না। গর্ভিণী হবার যন্ত্রণা তেমন কিছু নয় অসীমার কাছে। তাঁর আসল সমস্যাটা হ'ল যন্ত্রণার ফল নিয়ে ---

> সকালের শরীর খারাপ, রাতে ঘুম না আসা, পিঠের চাপা ব্যথা, বারবার বাথরুমে যাওয়া এসব তবু সহ্য করা যায়। সমস্ত সময়টা, শারীরিক অসুবিধা সত্ত্বেও, সে তার নিজের শরীরে প্রাণ সৃষ্টি করার ক্ষমতায় বিস্মিত হয়েছে, ঠিক যেমন তার মা বা দিদিমা বা পূর্বনারীরা হয়েছিলেন। স্বদেশ থেকে এত দূরে, ভালবাসার মানুষদের থেকে আলাদা হয়ে যে এটা ঘটতে পারছে, সেটাই বা কম অদ্ভুত নাকি? কিন্তু আত্মীয়স্বজনবিহীন, অল্পচেনা এক দেশে বাচ্চা বড় করার ভয়টাই তাকে পেয়ে বসেছে। এখানে জীবন কেমন যেন অনিশ্চিত, পরিমিত।[৪]

অসীমার বারবার মনে পড়ে যায় স্বদেশে তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের কথা -

> "যাদের এখন নতুন বাচ্চাকে ঘিরে থাকার কথা, তারা নেই ...... দাদু-দিদা, মাসি-পিসি, কাকা-মামাদের উপস্থিতি ছাড়া এই শিশুর জন্ম আমেরিকার অন্য সবকিছুর মতোই অগোছালো, যেন পূর্ণ নয়, আংশিক সত্য মাত্র।"[৫]

পুত্রসন্তান জন্মের পর অসীমা অধৈর্য হয়ে পড়েন। স্বামী অশোককে একদিন হঠাৎ করে বলে দেন ---

> "তাড়াতাড়ি ডিগ্রিটা শেষ করো ... এই দেশে আমি গোগোলকে একা মানুষ করতে পারব না। সেটা ঠিক হবে না। আমি ফিরে যেতে চাই।"[৬]

কিন্তু, ফিরতে চাইলেই তো আর ফেরা যায় না। প্রবাসে যাওয়াটা তাঁর কাছে যতটা সহজ ছিল, ফিরে আসার পথ ততটাই কঠিন হয়ে পড়ে।

অশোক ও অসীমা তাদের সন্তানের নাম রেখেছেন গোগোল। অবশ্য এই নবজাতকের নামকরণ করবার কথা ছিল অসীমার দিদিমার। কিন্তু ডাকবিভাগের গোলযোগে অসীমার দিদার পাঠানো নাম হারিয়ে যায়। এদিকে আমেরিকার হাসপাতালে জন্ম হলে, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার সময় সন্তানের নামকরণ করাটা একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। কাজেই একান্ত বাধ্য হয়েই অশোক তার পুত্রের একটা কাজ-চালানো গোছের নামকরণ করেছেন। 'গোগোল' – অসীমাও এই নামকরণ নিয়ে বিশেষ আপত্তি করেননি। ছেলের এই নামকরণ অবশ্যই রুশ সাহিত্যিকের প্রতি মুগ্ধতার প্রকাশ। কিন্তু এই নামকরণের মধ্যে একটা প্রতীকী তাৎপর্য রয়েছে। বিবাহের পূর্বে, স্বদেশে এক আকস্মিক রেল দুর্ঘটনায় যখন প্রাণ হারাতে বসেছিলেন অশোক, তখন গোগোলের গল্পসংগ্রহের একটা উড়ন্ত পৃষ্ঠাই তাঁকে রক্ষা করে। ছেলের নাম তাই ফিরে পাওয়া নবজীবনের প্রতীক হয়ে ওঠে অশোকের কাছে।

দিনে দিনে বড় হতে থাকে গোগোল। আমেরিকায় গোগোলের অবাঙালি বন্ধুদের বৃত্তও বাড়তে থাকে। গোগোলকে মানুষ করা নিয়ে অসীমার দুশ্চিন্তাও বাড়তে থাকে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে অসীমা-অশোকের আর একবার বাস পরিবর্তন করতে হয়। অসীমারা এখন বস্টনের বাইরে এই ইউনিভার্সিটি টাউনে থাকেন— এখানে তাঁরা ছাড়া আর কোন বাঙালি নেই। অশোকের স্বপ্নপূরণ হয়েছে। তিনি এখন ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অ্যাসিসট্যান্ট প্রোফেসর হিসেবে কাজ করছেন। তাঁর মতে, এক ঘরভর্তি মার্কিন ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর উত্তেজনাটাই আলাদা। পাঁচটা ক্লাস পড়িয়ে বেতন বছরে ষোলো হাজার ডলার। কিছুদিনের মধ্যে অশোক একটা টয়োটা করোলা গাড়িও কিনে নিয়েছেন। এক একর জমির উপর তৈরি করা একটা বাড়িও কিনে নেন। অশোকের স্বপ্নপূরণ হলেও অসীমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণত আলাদা। শহরতলীতে এসে থাকা তাঁর একেবারেই পছন্দ হয়নি। কলকাতা থেকে কেমব্রিজ আসার চেয়েও এই বাসস্থান বদল তার খারাপ লেগেছে। অশোকের কর্মপরিধির জগৎ দিনে দিনে বাড়তে থাকলেও অসীমার কাছে তাঁর নিজের জগৎ ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে যেতে থাকে ---

> "এখন সে সন্তানসম্ভবা নয় বটে, কিন্তু রাইস ক্রিস্পি, বাদাম আর পেঁইয়াজ মেখে সে এখনও খায়। কারণ তার মনে হয়, বিদেশে বাস করা জীবনভর গর্ভবতী থাকার মতো। এক চিরকালীন অপেক্ষা, ক্রমান্বয়ে ভারবহন করে চলা। ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব, স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে এক সরিয়ে রাখা অংশ। অবশ্য শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, সরিয়ে রাখা অংশটাই সত্য হয়ে উঠেছে, বাইরের 'স্বাভাবিক' জীবন অন্তর্হিত। আর এই নতুন জীবন আরও জটিল, অনেক বেশি দাবি করে। গর্ভধারণের মতোই এই প্রবাসী জীবন অচেনা মানুষজনের কৌতূহলের শিকার, দয়া ও শ্রদ্ধা মেশানো এক দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্র ... স্বামী কাজে গেলে সে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরোয় বটে, কিন্তু ওই যে, কথায় বলে, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।"[৭]

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে গোগোলকে যখন কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করা হ'ল তখন তার একটা প্রাতিষ্ঠানিক নামকরণ করা হল 'নিখিল'। পুরনো নামটির সঙ্গে এই নতুন নামটির একটা নান্দনিক যোগ রয়েছে। বাঙালিদের মধ্যে প্রচলিত ভাল নাম তো বটেই, নিখিলের সঙ্গে লেখক গোগোলের প্রথম নাম 'নিকোলাই'য়ের একটা ধ্বনিগত সাদৃশ্যো রয়েছে। কিন্তু ছোট্ট গোগোল তার এই নতুন নামকরণ কিছুতেই মেনে নিতে চায় না। অন্য কোনও নামে কেন তাকে সাড়া দিতে হবে সে বুঝতে পারে না। চোখে জল নিয়ে সে তার বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করে—

"আমাকে নতুন নাম নিতেই হবে কেন?"[৮]

তার মনে হয় যদি বাবা আর মাও তাকে নিখিল বলে ডাকত, তাহলে একটা কথা হত। কিন্তু তা নয়, নতুন নামটা শুধু নতুন স্কুলের টিচার ও ছেলে মেয়েরা ডাকবে। আর কেউ নয়। নিখিল হতে গোগোলের ভয় করে –

"সে তো নিখিলকে চেনে না। নিখিলও তো তাকে চেনে না।"[৯]

বাবা তাকে আশ্বস্ত করে –

"কিচ্ছু ভেবো না,.... আমার কাছে, তোমার মার কাছে, তুমি চিরকালই গোগোল থাকবে।"[১০]

শেষপর্যন্ত স্কুলের প্রিন্সিপাল গোগোলের সম্মতি নিয়ে গোগোলকে 'গোগোল' নামে ডাকাই স্থির করে নিলেন। গোগোলের বয়স যখন পাঁচ, অসীমা পুনরায় গর্ভবতী হন। গোগোল স্কুলে ভর্তি হবার পর অসীমার কোলে দ্বিতীয় সন্তান আসে। কন্যা সন্তান। এবার আর অশোক ও অসীমা সন্তানের নামকরণ নিয়ে কোনো ভুল করেননি। তার নামকরণ করা হয় সোনালী। বাড়িতে তাকে সোনু বলে ডাকে। অশোক অসীমা জানেন এই সোনালীই এক সময় সোনিয়া হয়ে যাবে। তাতে কোনো আক্ষেপ নেই। সোনিয়া নামটি তাকে বিশ্ব-নাগরিক হতে সাহায্য করবে। কেননা ইউরোপ বা দক্ষিণ আমেরিকায় সোনিয়া নাম বিশেষ জনপ্রিয়। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ইতালিয়ান স্ত্রীর নামও সোনিয়া।

পরিবেশ ও সংস্কৃতির বিশেষত্ব মানুষের চরিত্র গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, চরিত্র স্বাতন্ত্র্য এনে দেয়। আমেরিকায় জন্ম ও আমেরিকান সংস্কৃতির সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই পরিচয়ের ফলে গোগোল ও সোনিয়া ছোটবেলা থেকেই আত্মিকভাবে আমেরিকান হয়ে উঠতে থাকে। দুর্গাপুজো বা সরস্বতীপুজোর চেয়ে ক্রিসমাসেই তাদের আগ্রহ বেশি। জন, পল, জর্জ এবং রিংগোর গান গোগোলের ভীষণ পছন্দের। বাবার কিনে দেওয়া ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ক্যাসেটের মোড়কটি পর্যন্ত খুলে দেখার আগ্রহ নেই গোগোলের। গোগোল আত্মিকভাবে এতটাই আমেরিকান হয়ে ওঠে যে, এখন বাবার দেওয়া 'গোগোল' নামেও তার প্রবল আপত্তি। ছোটবেলায় স্কুলে ভর্তি হবার সময়ে সে 'গোগোল' থেকে 'নিখিল' হতে চায় নি কিছুতেই। কিন্তু সাবালক হবার পর সে নিজেই আইনি পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে নাম পরিবর্তন করে 'গোগোল' থেকে 'নিখিল' হয়ে যায়। বিখ্যাত লেখক নিকোলাই গোগোলকে সে একটুও ভালবাসেনা। গোগোলের লেখা বইও তার পচ্ছন্দ নয়। বাবা বারবার উৎসাহ দিলেও গোগোলের বা অন্য কোনও রাশিয়ান লেখা একটি শব্দও সে পড়তে চায়নি। গোগোলের ভাবতেও ঘেন্না করে যে, তার নামটা হাস্যকর আর বৈশিষ্ট্যহীন। সাবালক গোগোল এখন বুঝতে শিখেছে যে, তার একটা নিজস্ব সত্তা আছে। কিন্তু ওই নামটির সঙ্গে তার নিজস্ব সত্তার কোনও সম্পর্ক নেই। নামটি ভারতীয় বা আমেরিকান কোনোটাই নয়, রাশিয়ান। এই ভালনাম হয়ে ওঠা ডাকনামটা নিয়ে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটাতে তার একটুও ভাল লাগে না। প্রেমেও এই নাম বাধা হয়ে দাঁড়ায় ---

> "ওর বয়সের অন্য ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে ডেটিং করতে আরম্ভ করেছে। তারা বান্ধবীদের নিয়ে পিৎজা খেতে বা সিনেমা দেখতে যায়। কিন্তু গোগোল ভাবতেই পারে না কোনও রোমান্টিক পরিস্থিতিতে সে নিজেকে গোগোল বলে পরিচয় দিচ্ছে, বলছে "হাই, ইট্স গোগোল!" সে এটা কল্পনাও করতে পারে না।[১১]

বাঙালি খাবারের তুলনায় আমেরিকান খাবারই গোগোল ও সোনিয়ার বিশেষ পছন্দ। ছেলে-মেয়ের জেদের কাছে বারবার পরাস্ত হতে হয় অশোক ও অসীমাকে। তবুও তারা তাদের সাধ্যমতো গোগোল ও সোনিয়াকে নিজেদের বংশগত সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে চান। গোগোল যখন থার্ড গ্রেডে ওঠে তখন প্রতি শনিবার তাকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ক্লাসে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। গোগোলের এই ক্লাস একেবারেই ভাল লাগেনা। কলকাতা থেকে আনিয়ে নেওয়া বাংলা বইগুলির প্রতিও তার কোনো আকর্ষণ নেই –

> "বইগুলো কেমন যেন সস্তা কাগজে ছাপা! এ-রকম কাগজ তো ওরা স্কুলে টয়লেট পেপার হিসেবে ব্যবহার করে।"[১২]

বাংলা ভাষার প্রতিও গোগোলের বিশেষ আকর্ষণ নেই। বাবা-মা বাংলায় কথা বললেও গোগোল ইংরেজিতে উত্তর দেয়।

দিনে দিনে পুরোদস্তর আমেরিকান হয়ে ওঠে গোগোল। কলেজে ভর্তি হবার পর থেকেই সে ক্রমশ বাবা-মায়ের ধ্যান-ধারণা থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে। অশোক ও অসীমা ওঁদের সব বাঙালি বন্ধুদের মতো ওঁরাও চান ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হোক, বা ডাক্তার, বা আইনজীবী, কিংবা নিদেনপক্ষে একজন অর্থনীতিবিদ। কিন্তু গোগোল পড়াশুনোয় কোনো একটি বিশেষ বিষয়কে মেজর করে না নেওয়ায় তাঁরা গোগোলকে নিয়ে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। বাবা গোগোলকে বারবার বোঝাতে চেয়েও ব্যর্থ হন যে, কোনো একটি বিশেষ পেশাই তাকে নিশ্চিত জীবন ও সামাজিক শ্রদ্ধা দিতে পারে। কলকাতার ছেলে অশোক এই নিশ্চিত জীবন ও সামাজিক শ্রদ্ধার সন্ধানেই দূর প্রবাস আমেরিকায় বসবাস করছেন। কিন্তু গোগোল এখন আর 'গোগোল' নয়, সে 'নিখিল'। সুতরাং বাবা-মার ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনার প্রভাব থেকে বেরিয়ে যেতেই পারে---

“নিখিলের খোলসে থাকতে প্রথম সেমেস্টারে সে থুতনিতে ছোট্ট দাড়ি রাখে। পার্টিতে গিয়ে ক্যামেল লাইট্‌স সিগারেট খেতে শেখে। আর পরীক্ষার ঠিক আগে ব্রায়ান ইনো, এল্‌ভিস কস্টেলো আর চার্লি পার্কারকে খুঁজে পায়। নিখিলের ভূমিকাতেই সে জোনাথনের সঙ্গে মেট্রো করে ম্যানহাটনে যায়, জাল পরিচয়পত্র জোগাড় করে যাতে নিউ হ্যাভেনের মদের দোকানে মদ পেতে পারে। নিখিল হিসেবেই এজরা স্টাইলসের একটা পার্টিতে সে কুমারত্ব হারায়। মেয়েটা উলের স্কার্ট পরেছিল, উঁচু বুটজুতো আর কালচে-হলুদ রঙের টাইট্‌স। ভোর তিনটে নাগাদ প্রবল হ্যাংওভার নিয়ে জেগে উঠে সে দেখল, ঘরে কেউ নেই। মেয়েটান নাম মনে নেই নিখিলের।[১৩]

গোগোলকে নিয়ে বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তা সত্য হয়ে দেখা দিল অচিরেই। গোগোল পড়াশুনোর পাশাপাশি একটা আর্কিটেকচার ফার্মে কাজ জুটিয়ে নিলেও বাবা-মায়ের প্রত্যাশা এতে পূরণ হয় নি। কাজ পাবার পরেও বাবা তাকে প্রায় নিয়মিত চেক সই করে দিতেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার গোগোল একাধিক প্রাক্‌-বিবাহ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে থাকে। সে রুথ নাম্নী একটি মেয়ের সঙে শারীরিক সম্পর্ক করেছে। এসব ব্যাপার যে বাবা-মায়ের কাছে একেবারে অজ্ঞাত ছিল এমন নয়। এই প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ায় তাঁরা খুশি নন, গর্বিতও নন। রুথের অবশ্য তাতে বিশেষ হেলদোল নেই। গোগোলের বাবা-মায়ের এই অখুশি হওয়াটাকে তার কাছে বেশ রোমান্টিক বলেই মনে হয়। গোগোল ভাবে রুথের সঙ্গে তার এই সম্পর্ক বাবা-মায়ের সহজভাবেই মেনে নেওয়া উচিত। কিন্তু রুথের সঙ্গে গোগোলের সম্পর্ক মজবুত হবার পূর্বেই ভেঙে গেল। রুথ ইংল্যান্ডের একটি গ্র্যাজুয়েট স্কুলে পড়তে যেতে চায়। সে চায় গোগোলও তার সঙ্গী হয়ে ইংল্যান্ডের কোনো আর্কিটেকচার স্কুলে যোগদান করুক। কিন্তু গোগোল রুথের সহযাত্রী হতে পারেনি। কাজেই তাদের সম্পর্কের মধ্যেও চিরকালের জন্য বিচ্ছেদরেখা টানা হয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে বাঙালি বা ভারতীয় যুবক-যুবতীদের সঙ্গে আমেরিকান যুবক-যুবতীদের জীবনশৈলির এক বিরাট পার্থক্য রয়েছে। প্রেমের জন্য ত্যাগ স্বীকার নয় - প্রবল আত্মবিশ্বাসী আমেরিকান ছেলেমেয়েরা নিজেদের উজ্জল কেরিয়ারের জন্য প্রয়োজনে ‘প্রেম’কে ত্যাগ করতেও প্রস্তুত।

১৯৯৪ সাল থেকে গোগোল নিউ ইয়র্কে থাকতে শুরু করে। কলম্বিয়া থেকে আর্কিটেকচারে সে স্নাতক হয়েছে। তারপর থেকেই সে নিউইয়র্কের একটা বড় সংস্থায় কাজ করে। কিন্তু রোজগারের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। বাবার ইচ্ছে ছিল গোগোল এম.আই.টি-তে পড়াশুনো করে সেখানেই ভাল একটা চাকুরি করুক। অথচ গোগোলের ভাবনা সম্পূর্ণ বিপরীত। আসলে প্রশ্নহীনভাবে বাবা-মা’র পৃথিবীতে ঢুকে পড়ার সহজ রাস্তায় চলতে তার মন সায় দেয়নি কখনও। নিউইয়র্কে থাকাকালীন গোগোল তারই প্রায় সমবয়সী এক যুবতী ম্যাক্সিনের প্রেমে পড়ে। ম্যাক্সিন কলম্বিয়া-বার্নার্ড থেকে আর্ট হিস্ট্রিতে মেজর করেছে। ব্যক্তিগত জীবনে ম্যাক্সিন ভীষণ খোলামেলা। ম্যাক্সিন নিজের অতীত ঢেকে রাখার কোনো চেষ্টা করে না। সে গোগোলকে মার্বেল কাগজের অ্যালবাম খুলে পুরনো প্রেমিকদের ছবি দেখায়। নিজের জীবন নিয়ে ম্যাক্সিনের কোনো দুঃখ নেই। নিজের জীবন নিয়ে তার কোনো হতাশা বা অপ্রাপ্তির বোধও নেই। বাবা-মায়ের সঙ্গে ম্যাক্সিনের সম্পর্কে কোনো দূরত্ব নেই। যে কোনো ঘটনার কথা সে অনায়াসে বাবা-মাকে খুলে বলতে পারে। গোগোলের মনে হয়—

“তাদের দু’জনের মধ্যে এই পার্থক্যটিই সবচেয়ে গভীর। ম্যাক্সিনের এই বিরাট বাড়িটায় বড় হয়ে ওঠা বা দামি পাবলিক স্কুল এডুকেশনের চাইতে এই মানসিক স্থৈর্যই তাকে গোগোলের চেয়ে আলাদা করে রাখে।”[১৪]

ম্যাক্সিন গোগোলের জীবন সম্পর্কে কিছু কথা শুনে অবাক হয়ে যায়---

“বাবা-মায়ের সব বন্ধুই যে বাঙালি, তাঁদের সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছিল, মা রোজ ভারতীয় পদ রান্না করেন, তিনি শাড়ি আর টিপ পরেন।”[১৫]

গোগোল ম্যাক্সিনের বাবা-মা জেরাল্ড ও লিডিয়াকে দেখে বেশ অবাক হয়ে যায়। ব্যক্তিগত জীবনে তারা কত স্বাভাবিক ----

“লিডিয়ার জন্মদিনে জেরাল্ডের দেওয়া দামি গয়না, কোনও কারণ ছাড়াই বাড়িতে ফুল নিয়ে আসা, পরস্পরকে খোলাখুলি চুমু খাওয়া, শহরের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে যাওয়া বা বাইরে ডিনার করতে যাওয়া .... সন্ধেয় সোফার উপরে জেরাল্ড ও লিডিয়াকে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা থাকতে দেখে গোগোল ভাবে, তার

নিজের বাবা-মার মধ্যে সে সারাজীবনে একবারও শারীরিক ঘনিষ্ঠতা দেখেনি। ওদের মধ্যে যদি প্রেম থেকেও থাকে, তা একেবারেই ব্যক্তিগত, কোনওভাবে প্রকাশ করার যোগ্য নয়।"[১৬]

ম্যাক্সিনকে এসব কথা জানালে উত্তর আসে –

"কী দুঃখের ব্যাপার!"[১৭]

গোগোল প্রায় নিয়মিত ম্যাক্সিনের সঙ্গে রাত কাটায়, ম্যাক্সিনের বাবা-মায়ের সামনেই, এক ছাতের নীচে। সপ্তাহান্তে ছুটি পেলেও সে নিউইয়র্ক থেকে ফিরে বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতেও আসতে চায় না। সোনিয়াও এখন পড়াশুনোর প্রয়োজনে বাবা-মায়ের থেকে দূরে থাকে। ছেলেমেয়েদের কাছে না পেয়ে অসীমা প্রবল মনোকষ্টে ভুগতে থাকেন।---

"আমেরিকায় আসার পর থেকে নিজের বাবা-মায়ের সঙ্গে দূরত্ব যাওয়াটা অসীমকে এতই কষ্ট দিয়েছে যে, সে কিছুতেই বুঝতে পারে না তার ছেলে বা মেয়ের এত স্বাধীনতা প্রয়োজন কেন। কেন তাদের দরকার হয় মায়ের থেকে দূরে থাকার। তবু সে এ নিয়ে কোনও তর্ক করে না ... এ নিয়ে লাইব্রেরির বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে তারাও বলে, এমনটা হবেই। ছেলে-মেয়েরা সবসময় ছুটিতে বাড়ি ফিরবে, এমন আশা করা উচিত নয়।"[১৮]

প্রকৃতপক্ষে গোগোল ও সোনিয়া বাঙালি বাবা-মায়ের সন্তান হলেও জন্ম তাদের আমেরিকায়। ছোটবেলা থেকেই তারা ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে তারা বড় হয়েছে। বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের আত্মিক যোগ গড়ে ওঠেনি কখনই। আমেরিকান ছেলে-মেয়েরা একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর বাবা-মায়ের থেকে আলাদা থাকতেই পছন্দ করে। এমন নয় যে, গোগোল ও সোনিয়া তাদের বাবা-মাকে ভালবাসে না, কিন্তু তারা আমেরিকান ছেলে-মেয়েদের মতো আলাদা থাকাটাকেই শ্রেয় বলে মনে করে। সুতরাং গোগোল ও সোনিয়ার পক্ষে যা যা স্বাভাবিক – একান্তভাবে বাঙালি-প্রাণ অসীমার কাছে সেগুলিই অস্বাভাবিক ঠেকে। অসীম চান আর না-ই চান এই নিয়তিকে মেনে নেওয়া ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় নেই। অসীমা তখন সান্ত্বনা পেতে চান শুধু এই ভেবে যে, তিনি দুটো ভবঘুরে ছেলে-মেয়ের জন্ম দিয়েছেন। ছেলে-মেয়েরা যখন আলাদা থাকতে শুরু করেছে, তখন তাঁর একমাত্র অবলম্বন স্বামী অশোক। কিন্তু, স্বামীও একদিন অসীমাকে একা রেখে কিছুদিনের জন্য ক্লিভল্যান্ডে একটা চাকুরিতে যোগদান করলেন। অসীমার নিঃসঙ্গতা চরম আকার ধারণ করল ক্লিভল্যান্ডে স্বামী অশোকের অকাল প্রয়াণের পর থেকে। হতাশ অসীমা বুঝতে পারেন –

"কেন উনি ক্লিভল্যান্ডে গিয়েছিলেন। আমাকে একলা থাকা শেখাচ্ছিলেন।"[১৯]

আরেকটি বিষয় এখানে বলে রাখা ভাল যে, 'স্বাধীনতা' ও 'স্বেচ্ছাচার' – শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে এই পার্থক্যের বোধ বাঙালি বা ভারতীয় সমাজজীবনে যতটা স্পষ্ট, বিদেশে ততটা স্পষ্ট নয়। আমেরিকান বাবা-মায়েরা নিজেদের প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের এক বা একাধিক প্রাক্-বিবাহ যৌন সম্পর্ক নিয়ে বিশেষ ভাবিত নয়। যৌনতা নিয়ে তাদের রাখঢাক একেবারেই নেই। কিন্তু বাঙালি বা ভারতীয় সমাজে প্রাক্-বিবাহ বা বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্ক যৌন-ব্যভিচার বলেই গণ্য হয়ে থাকে। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, একালের বাঙালি সমাজেও নরনারীর যৌন সম্পর্কের মধ্যে কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। শহরাঞ্চলের শিক্ষিত বাঙালি নরনারীদের অনেকেই এখন যৌনতাকে শুধু বিবাহের শাস্ত্রসম্মত শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখতে চাইছেন না। কিন্তু, একথা মানতেই হবে যে, শহর কলকাতার নিউইয়র্ক হয়ে উঠতে এখনও ঢের দেরি। 'সমনামী' উপন্যাসে দুই সন্তানের জননী অসীমার বিড়ম্বনা তাঁর ছেলে-মেয়ের স্বাধীনতা নিয়ে নয়, তাদের স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠাকে কেন্দ্র করে।

বৎসরাধিককাল ধরে গোগোল তার পছন্দের পাত্রী ম্যাক্সিনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছে, নিয়মিত তার সঙ্গে উদ্দাম শারীরিক মিলনে লিপ্ত হচ্ছে। অসীমা ম্যাক্সিনকে তাঁর পুত্রবধূ হিসেবে মোটেই মেনে নিতে চান না ---

"যদিও একেবারে আলাপে ম্যাক্সিনের সঙ্গে সে ভালই ব্যবহার করেছে, ম্যাক্সিনকে সে মোটেই ছেলের বউ হিসেবে দেখতে চায় না। ম্যাক্সিন যখন তাকে অসীমা আর গোগোলের বাবাকে অশোক বলে ডাকল, তখন খুব অবাক লেগেছিল তার।[২০]

কিন্তু, সংস্কৃতির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই সম্পর্ক মেনে নেওয়া ছাড়া অসীমা আর কোনো উপায় খুঁজে পেলেন না। অসীমা স্পষ্টত অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, বাঁধভাঙা জলস্রোত আটকাবার প্রয়াস বৃথা। কিন্তু ট্র্যাজেডি এখানেই যে, অসীমা যখন ম্যাক্সিনকে মনে মনে মেনেই নিয়েছেন – তখনই গোগোল-ম্যাক্সিনের সম্পর্ক চিরকালের জন্য ভেঙে গেল। বাবা মারা যাবার পর গোগোলের মানসিকতায় পরিবর্তন দেখা দেয়। এতদিন সপ্তাহান্তে বা মাঝে মাঝে অফিস থেকে ছুটি পেলেও গোগোল বাবা-মা-বোনের সঙ্গে দেখা না করে ম্যাক্সিনের সঙ্গে ঘুরে ফিরে ছুটি কাটিয়েছে। এখন সে তার বোন সোনিয়া ও বিধবা মায়ের কথা ভেবে তাদের সঙ্গে সপ্তাহান্তে দেখা করতে যায়। রোজ সন্ধেয় মা ও বোনের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন বোধ করে। পারিবারিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কেও অনেকটা সচেতন হয়ে ওঠে। ম্যাক্সিনের সঙ্গে তার উদ্দাম যৌনতায়ও কিছুটা ভাঁটা পড়ে। এই পরিস্থিতিতে ম্যাক্সিন নিজেকে, নিজের মনকে স্থির রাখতে পারেনি ---

> "প্রথম প্রথম ম্যাক্সিন ধৈর্য ধরেছিল। গোগোলকে ধাতস্থ হতে সময় দিয়েছিল। অফিসের পর জেরাল্ড আর লিডিয়ার বাড়িতে ফিরে যেত গোগোল, সেই দুনিয়ায় যেখানে কিছুই বদলায়নি, সবই আগের মতো। ডিনার টেবিলে গোগোলের নীরবতা কিছুদিন মেনে নিয়েছিল ম্যাক্সিন। মেনে নিয়েছিল যৌনমিলনে তার অনাগ্রহ, রোজ সন্ধেয় মা আর সোনিয়ার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন, উইকএন্ডে প্রেয়সীকে একা রেখে পেম্বারটন রোডে ফিরে যাওয়া। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে চায়নি একটা কথা। সে গোগোলের প্রেমিকা হওয়া সত্ত্বেও কেন তাকে না নিয়ে গোগোলেরা সেই গ্রীষ্মে সকলের সঙ্গে দেখা করতে আর অশোকের অস্থিভস্ম গঙ্গায় নিক্ষেপ করতে কলকাতায় যাবে। সেই থেকে তর্কাতর্কি শুরু। একদিন ম্যাক্সিন বলেই ফেলল, মা আর সোনিয়াকে তার হিংসে হয়। গোগোলের এ কথাটা এতই অবাস্তব ঠেকেছিল যে, সে কোনও উত্তর দেয়নি।"[২১]

সুতরাং, বাবার মৃত্যুর কয়েকমাস পরে গোগোল ম্যাক্সিনের জীনব থেকে বেরিয়ে এল। প্রকৃতপক্ষে গোগোল-ম্যাক্সিনের প্রেমে গভীরতা কম। এই প্রেম একান্তই শরীরসর্বস্ব। কাজেই বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ক তৈরি হবার পূর্বেই যখন শরীরের দাবি মিটে গেছে, যৌনতায় বৈচিত্র্যের অভাব দেখা দিয়েছে, তখন সহজেই সে প্রেম ভেঙে গেছে। তাছাড়া, ম্যাক্সিনের মন আদৌ বাঙালির একান্নবর্তী পরিবারের বধূ হবার পক্ষে উপযুক্ত নয়। সবচেয়ে বড় কথা প্রেমিক ও প্রেমিকা যেখানে ভিন্ন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে, সেখানে একে অন্যের সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল থাকাটা একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। প্রেমিকা ম্যাক্সিনকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় যাওয়া, সেখানে খোলামেলা জীবনযাপন করা যে সম্ভব নয় – তা বোঝার ক্ষমতা ম্যাক্সিনের ছিল না। ম্যাক্সিন চেয়েছিল গোগোল শুধু ওকে নিয়েই মেতে থাকুক, যা পিতৃ-বিয়োগের পর গোগোলের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, পিতৃবিয়োগের পর বাবার আদর্শকে সম্মান করতে শুরু করেছে গোগোল। যে একসময় নিজেকে আত্মিকভাবে মার্কিন সত্তার অধিকারী বলে মনে করত সে এবার স্বেচ্ছায় মস্তকমুণ্ডন পর্যন্ত করেছে। বাবার অস্থিভস্ম গঙ্গায় বিসর্জন দিতেও তার আপত্তি নেই। বোঝা যায়, গোগোল এবার নিজের শিকড় চিনতে শুরু করেছে।

ম্যাক্সিনের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর গোগোল জনৈকা বিবাহিতা রমনী ব্রিজেটের সংস্পর্শে আসে। ব্রিজেট নিউ অরলিয়ান্সের মেয়ে, বেশ আকর্ষক চেহারা, একটা ছোট ফার্মে চাকুরি করে। গোগোল তার সঙ্গে নিজেদের প্রোজেক্ট নিয়ে আলোচনা করে, একসঙ্গে বারে খেতে যায়। এভাবেই তারা ক্রমশ একে অন্যের কাছাকাছি আসে। ব্রিজেটের স্বামী বস্টনের কলেজের প্রোফেসর, শুধু শনি ও রবিবার দুজনের দেখা হয়। গোগোলের মনে হয় এভাবে একা থাকা নিশ্চয়ই কঠিন, কেননা – সে নিজেই দেখেছে তার বাবার জীবনের শেষকটা মাস দু'জনে দু'শহরে কাটিয়েছে। গোগোল ব্রিজেটের কাছেই শুনতে পেয়েছে যে, তার স্বামী ব্রুকলিনের বাড়িতে নেমপ্লেটে ব্রিজেটের নাম লিখে রেখেছে, অ্যানসারিং মেশিনে ব্রিজেটের গলা, আলমারিতে ব্রিজেটের পোশাক, এমনকি ব্রিজেটের একটা লিপস্টিকও সেখানে রয়েছে। ব্রিজেটের স্বামী এই চিহ্ন ও বস্তুগুলি আগলে রেখে সারা সপ্তাহ ব্রিজেটের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। স্বামীর ভালবাসা যে স্ত্রীর প্রতি এত প্রবল, সেই স্ত্রী কিন্তু দূরত্বের যন্ত্রণা নিয়ে এতটা ভাবিত নয়। তার মতে, এভাবে আলাদা থাকা কঠিন হতে পারে, কিন্তু মেনে নিতে হয়। গোগোলের মনে এক ধরণের অপরাধবোধ তীব্র হয়ে ওঠে, যখন সে দেখতে পায় স্বামীর প্রবল ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও ব্রিজেট নিজের শরীর একাধিক পরপুরুষের কাছে বিলিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততবোধ করে না। গোগোল স্পষ্ট বুঝতে পারে প্রেমে শরীরের দাবিই এখানে মুখ্য। বাবার

অকাল মৃত্যুর পর গোগোল এমনিতেই মানসিকভাবে বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিল, তার পর ব্রিজেটের সঙ্গে পরিচয়ের পর গোগোলের মানসিকতায় আরও ব্যাপক পরিবর্তিন দেখা দেয়। গোগোল ব্রিজেটকে এড়িয়ে গিয়ে ক্রমশ শান্ত ও নিশ্চুপ হয়ে পড়ে। লক্ষণীয়, গোগোলের জীবনে যে-সব নারী এসেছে তারা সকলেই স্বাবলম্বী, প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী। সম্পর্ক যেখানে নির্ভরশীলতার নয় সেখানে সামান্য কারণেই তা ভেঙে যেতে পারে। হয়তো আজ আর একথা নতুন করে ভেবে দেখবার প্রয়োজন নেই যে, --

> “ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যেই নিহিত ছিল মানুষের উত্তরকালীন নিঃসঙ্গতার বীজ।”[২২]

একের পর এক সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া এবং গোগোলকে ক্রমশ শান্ত ও নিশ্চুপ হয়ে যেতে দেখে অসীমা বিচলিত হয়ে পড়েন। গোগোলের এই একাকিত্ব তাঁকে যন্ত্রণা দেয়। সদ্য স্বামীহারা অসীমার নিজের জীবনে একাকিত্বের যন্ত্রণা তো রয়েছেই, এবার তাঁকে পুত্রের একাকিত্ব নিয়েও ভাবতে হচ্ছে। গোগোলের জীবনে একের পর এক আমেরিকান মেয়ে এসেছে অনেক, কিন্তু সত্যিকারের প্রেম আসেনি। এবার অসীমা নিজেই উদ্যোগী হয়ে তাঁর ছেলের সঙ্গে এক প্রবাসী বাঙালি ঘরের কন্যা মৌসুমীর যোগাযোগ করিয়ে দেন। অসীমা হয়তো ভেবেছিলেন দুই ভিন্ন সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী যুবক-যুবতীর প্রেম সার্থক হতে পারে না। তাই তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে গোগোলের সঙ্গে মৌসুমীর যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিলেন।

মৌসুমী প্যারিসে পড়াশুনো করেছে। এখন নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি সাহিত্য নিয়ে পি.এইচ.ডি. করছে। মৌসুমী ও গোগোল তাদের বাবা-মায়েদের খুশি করবার জন্যেই নিয়মিত মিলিত হতে থাকে। গোগোলের জোবনে যেমন একের পর এক সম্পর্ক ভেঙে গেছে, তেমনি মৌসুমীরও আমেরিকান যুবক গ্রাহামের সঙ্গে ঠিক হওয়া বিয়েও ভেঙে গেছে দুই ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবে। গোগোল ও মৌসুমী উভয়েই নিজের নিজের ইচ্ছেয়, নিজস্ব ঢঙে বাস্তব জীবনপথে চলতে গিয়ে চলতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে এরা দুজনেই যখন মানসিকভাবে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তখন সঙ্গত কারণেই গোগোল ও মৌসুমীকে পরিবারের পাতানো সম্পর্ক মেনে নিতে হয়েছে। মৌসুমী বাঙালি ঘরের মেয়ে। ছোটবেলায় সে আমেরিকান টিভি চ্যানেল পর্যন্ত দেখতে চাইত না। কিন্তু ক্রমশ সে আত্মিকভাবে এতটাই আমেরিকান হয়ে উঠেছে যে, সে বাঙালি ছেলেদের মনেপ্রাণে গৃণা করতে শুরু করে –

> “বারো বছর বয়সে চেনা দুই বাঙালি বন্ধুর সঙ্গে মিলে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, বাঙালি ছেলেকে কক্ষনও বিয়ে করবে না। কথাটা একটা কাগজে লিখে তারা তিনজনে সেটার উপর একসঙ্গে থুতু ফেলেছিল আর ওর বাড়ির পিছনের উঠোনে পুঁতে ফেলেছিল।”[২৩]

মৌসুমী যেমন ছোটবেলাতেই প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে কোনো বাঙালি ছেলেকে বিয়ে করবে না, গোগোলও একসময় মৌসুমীর মতোই একই মানসিকতার অধিকারী ছিল। সুতরাং, এবার দুজনেই বাঙালি পরিবারের ছেলেমেয়ে হওয়া সত্ত্বেও, একমাত্র সমমানসিকতার কারণেই তারা একে অন্যের খুব কাছাকাছি চলে এল –

> “তিনমাসের মধ্যেই গোগোল আর মৌসুমী পরস্পরের অ্যাপার্টমেন্টে টুথব্রাশ আর জামাকাপড় রাখতে শুরু করে দিল।”[২৪]

কিন্তু, মৌসুমী আদতে না ভারতীয় না আমেরিকান, তার ব্যক্তিসত্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ---

> “ব্রাউনে পড়ার সময় মৌসুমী প্রথম বিপ্লব করেছিল, কিন্তু তা লেখাপড়ার জগতেই। বাবা-মায়ের উৎসাহে সে কেমিস্ট্রিতে মেজর করেছিল, তাঁরা ভেবেছিলেন যে, মেয়ে বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। তবে তাঁদের না বলে মৌসুমী কেমিস্ট্রির সঙ্গে সঙ্গে ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যেও মেজর করে ফেলল। তৃতীয় এক সংস্কৃতি ও ভাষার সন্ধানে ফরাসি নিয়ে মৌসুমী আগ্রহী হয়েছিল ...... সে-দুটি দেশের দাবি মৌসুমীর উপরে ছিল, সেগুলিকে ছেড়ে তৃতীয় এমন এক দেশের দিকে ঝুঁকল সে, যেটার সঙ্গে দাবিদাওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই।[২৫]

কিন্তু, ব্রাউনে পড়ার সময় মৌসুমী ক্রমাগত একা হয়ে পড়েছিল। ভারতীয়দের সঙ্গে সে মিশত না, আর টিনএজার হিসেবে তাকে ডেটিং করতেও দেওয়া হোত না। বয়ঃসন্ধির সময় শারীরিক পৃথুলতার কারণে আত্মবিশ্বাসেরও প্রচণ্ড অভাব দেখা দিয়েছিল। প্যারিসে চলে যাবার পর তার জীবন হঠাৎ খুব সহজ হয়ে উঠল। এত দিনের ‘না-পাওয়া’ সে এবার যেন সুদে-আসলে বুঝে নিতে লাগল। মৌসুমীর শরীর সংস্কার একেবারেই নেই। শরীর নিয়ে খোলামেলা হবার প্রতিযোগিতায় সে মার্কিন যুবতীদেরও হারিয়ে দিয়েছে ---

> "যে মৌসুমী ভেবেছিল তার আর প্রেমিক জুটবে না, সে খুব দ্রুত প্রেমে পড়তে শুরু করল। একটুও না ভেবে পার্কে, কাফেতে বা মিউজিয়ামে যে-কোনও পুরুষের জালে ধরা দিতে লাগল। নিজেকে পুরোপুরি উজাড় করে দিত, পিছুটান বা রাখঢাক না রেখে ...... ছেলেদের পয়সায় ড্রিংকস আর ডিনারে তার আপত্তি ছিল না, আপত্তি ছিল না রাতে ট্যাক্সিতে করে ছেলেদের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছাতেও। এমন সব পাড়ায় সে গিয়ে পৌঁছাতে লাগল যেখানে একা একা কখনও যেতে পারত না ... সেই সময়কার পুরুষ-বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ বিবাহিত ছিল, কেউ ছিল হাইস্কুলের ছেলে-মেয়ের বয়স্ক বাবা। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ফরাসি বটে, কিন্তু জার্মান, পারসিক, ইতালিয়ান বা লেবানিজও ছিল। কোনও কোনও দিন দুপুরে খাবার খেয়ে সে একজন পুরুষের সঙ্গে বিছানায় যেত, রাতের ডিনার শেষ করে অন্য এক পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হত। সেই পুরুষের দল তাকে পারফিউম আর গয়না উপহার দিত।[২৬]

এক বছরের মধ্যে খুব ঘটা করে গোগোল ও মৌসুমীর বিয়ে হয়ে গেল। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে গোগোল-মৌসুমীর বিবাহের এক বছর পূর্ণ হ'ল। এর মধ্যেই গোগোল ও মৌসুমীর মানসিকতায় দৃশ্য ও অদৃশ্য নানা পরিবর্তন ঘটে গেছে। মৌসুমী আসলে স্বচ্ছন্দ-স্বৈরিণী। বিবাহের পরও বন্ধুদের দলের প্রতি মৌসুমীর আনুগত্য গোগোলকে বিস্মিত করে। তাছাড়া যখন তখন নেশা করাও গোগোলের ভালো লাগে না ---

> "প্রথমদিকে মৌসুমীর এই সিগারেট খাওয়ার স্বভাবও গোগোলকে ভাবায়নি। বরং যৌনমিলনের পর মৌসুমী যখন বেডসাইড টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে সিগারেটে আগুন দিত, ভালই লাগত গোগোলের। তার পাশে শুয়ে চুপচাপ সিগারেটে টান দিত মৌসুমী, ধোঁইয়ার রিং মাথার উপর দিয়ে ছাদের দিকে উড়ে যেত। কিন্তু এতদিন পরে সে-সব আর ভাল লাগে না। মৌসুমীর চুলে আর আঙুলের ডগায় ধোঁয়ার বাসি গন্ধ, শোবার ঘরে কম্পিউটারে কাজ করে বলে সেখানেও সিগারেটের গন্ধ। গোগোলের এখন বিরক্ত লাগে। কখনও কখনও মনে হয়, এই নেশার জালে জড়িয়ে মৌসুমী ওকে ছেড়ে যেতেও পারে।"[২৭]

গোগোলের এই আশঙ্কা সত্যি হতে বেশি দিন লাগে নি ---

> "কোথায় যেন মৌসুমীর মনে আলোড়ন হয়। যে জীবনটা থেকে নিজেকে পুরোপুরি আলাদা করে নেওয়ার জন্য সে পালিয়ে বেড়িয়েছে, আজ গোগোলের উপস্থিতি তাকে সেই জীবনেই বেঁধে রাখতে চায়। গোগোল তাকে সেই পুরনো জীবনচর্যার কথাই মনে করিয়ে দেয়। এতে গোগোলের কোনও দোষ নেই, মৌসুমী জানে। তবে যে-পুরুষটির সঙ্গে নিজেকে কল্পনা করেছে সে, গোগোল সেই পুরুষ নয়। কোনওদিন ছিল না।"[২৮]

ঘটনাচক্রে মৌসুমীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল স্বপ্নের সেই পুরুষের – যাকে মৌসুমী ভালবেসে ছিল হাইস্কুলে পড়ার সময়ে। তার জীবনে ফিরে আসে সেই পুরনো প্রেম। দিমিত্রির বর্তমান বায়োডাটা দেখে চমকে যায় মৌসুমী। ইউরোপ ভ্রমণ, বি বি সি-তে চাকরি, জার্মান আর ইংরেজি সংবাদপত্রে প্রকাশিত লেখা, হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জার্মান সাহিত্যে ডক্টরেট। গোগোলের অগোচরে প্রথমে সপ্তাহে দু'দিন, পরে সপ্তাহে তিনদিন, মৌসুমী উনচল্লিশ বছর বয়সের পুরুষ দিমিত্রির সঙ্গে দেখা করতে যায় –

> "উত্তাল শারীরিক মিলন শেষ হলে ওরা অবাক হয়ে দেখে বিছানাটা জায়গা থেকে অনেকটা সরে গিয়েছে।"[২৯]

গোগোলের কথা ভেবে মৌসুমীর মনে সাময়িক একটা অস্বস্তি দেখা দিলেও, দিমিত্রির কাছ থেকে সরে আসবার কথা সে ভাবতে পারে না –

> "আচ্ছা, মৌসুমীর আগে কি তার পরিবারের কেউ বিয়ের বাইরে সম্পর্ক করেনি? কেউ কি ঠকায়নি নিজের স্বামীকে? সবচেয়ে অস্বস্তিকর ব্যাপারটা হল, এই অবৈধ প্রেম তাকে এক ধরনের শান্তিও দিয়েছে।"[৩০]

গোগোল ও মৌসুমী নিতান্তই আবেগের বশে বিয়ে করেছিল। এটা তাদের জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল। তবে স্বস্তির ব্যাপার –

> "গোগোল আর মৌসুমী বিশ্বাস করে না যে, সম্পর্ক যত খারাপই হোক বিয়ে টিকিয়ে রাখা জরুরী।"[৩১]

বাঙালি দম্পতির জীবনবোধের সঙ্গে গোগোল ও মৌসুমীর বিস্তর পার্থক্য। কিছুদিনের মধ্যেই গোগোলের অফিসে এসে ডিভোর্সের কাগজে সই করিয়ে নিয়ে যায় মৌসুমী।

উপন্যাসের শেষে অসীমার আত্মসংকট তীব্র হয়ে ওঠে। গোগোলের বিয়ে ভেঙে গেছে। সে হয়তো পাকাপাকিভাবে নিউ ইয়র্কেই থেকে যাবে। সোনিয়াও তার আমেরিকান বন্ধু বেনকে বিয়ে করে অন্যত্র চলে যাবে। পেম্বারটন রোডের সেই বাড়িটায় অসীমা একা, নিঃসঙ্গ। গোগোলের কথা ভেবে তাঁর মনে ভীষণ কষ্ট হয়। তিনিই তো সব ভালোভাবে না জেনে গোগোলের সঙ্গে মৌসুমীর যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন। অসীমা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, বর্তমান সময়কার ছেলেমেয়েরা তাদের পছন্দই আদর্শ অবস্থার বাইরে অন্য কোনওভাবে জীবন কাটাতে অস্বীকার করে। তাদের জীবন-যাপনের ধরণটাই সম্পূর্ণ ভিন্ন। চাপিয়ে দেওয়া জীবনাদর্শ তাদের কাছে একেবারেই গ্রহণীয় নয়। আমেরিকান জীবনবোধের কাছে, বাস্তববোধের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির চাপ কোথাও না কোথাও হেরে গিয়েছে। অসীমা ঠিক করেছেন, তিনি ভারতে ফিরে যাবেন। ছ'মাস ভারতে, ছ'মাস আমেরিকায় – এভাবেই জীবনের বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দেবেন। স্বামী বেঁচে থাকার সময়ে এমনি একটি পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। এবার অসীমাকে একা একাই সেই পরিকল্পনা মেনে চলতে হবে। কলকাতায় অসীমা তাঁর ছোটভাই রানার সঙ্গে থাকবেন। রানা সপরিবারে সল্টলেকের বিরাট একটা ফ্ল্যাটে থাকে। জীবনে এই প্রথম সম্পূর্ণ নিজের জন্য একটা ঘর পেতে চলেছেন অসীমা। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, অসীমা যদিও ভারতে ফিরতে চান, এবং এখনও তিনি শাড়ি পরেন, খোঁপা বাঁধেন; তবুওএকসময়কার সেই উত্তর-কলকাতার মেয়ে অসীমা আর এই আমেরিকার অসীমা এক নারী নন। আমেরিকান পাসপোর্টের মালিক এই অসীমা কলকাতায় থেকেও যে স্বস্তি পাবেন না, তা তিনি ভাল করেই জানেন ---

> আসলে স্বীকার করতে যতই অসুবিধে হোক, আমেরিকার জন্য মন খারাপ করবে অসীমার। এই দেশেই তো তার স্বামীকে চিনেছিল সে, ভালবেসেছিল। স্বামীর অস্থিভস্ম যতই হোক, গঙ্গায় ছড়িয়ে দেওয়া হোক না কেন, অসীমার স্বামী তো এ-দেশেই বেঁচেছিল। এই বাড়িতে, এই শহরেই তার সবচেয়ে উজ্জ্বল স্মৃতিগুলো ছড়িয়ে রয়েছে। অসীমার কাছে স্বামীর স্মৃতি মানেই আমেরিকা।[৩২]

কাজেই, ছ'মাস ভারতে থাকার পরিকল্পনা করলেও আদতে তিনি ক'মাস ভারতে থাকতে পারবেন, তা নিশ্চিত নয় কিছুতেই। আবার আমেরিকায় থাকার সময়েও বারবার তাঁর কলকাতায় ফিরে যাবার জন্য মন আনচান করবেই। তাই জীবনের শেষদিনগুলি একপ্রকার ত্রিশঙ্কু হয়েই কাটিয়ে দিতে হবে – এটাই অসীমার জীবনের সবচেয়ে বড় নিয়তি –"বসন্তে আর গ্রীষ্মে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ফিরবে। পালা করে ছেলে, মেয়ে আর বাঙালি নিকট বন্ধুদের সঙ্গে থাকবে। নিজের নামকে এভাবেই সার্থক করতে চলেছে অসীমা। এখন থেকে সে সত্যিই সীমাহীন, অনিকেত।"[৩৩] বাঙালি নারীর এমন আত্মসঙ্কটের চিত্র, শিকড় ও শেকড়হীনতার আখ্যান সত্যিই অসাধারণ তাৎপর্য পেয়েছে ঝুম্পা লাহিড়ীর 'সমনামী' উপন্যাসে।

তথ্যসূত্র :

১। 'দেশ' ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সংখ্যা। পৌলোমী সেনগুপ্তকে দেওয়া সাক্ষাৎকার। পৃষ্ঠা – ২২।
২। লাহিড়ী ঝুম্পা, 'সমনামী' চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা – ৯, পৃষ্ঠা – ১৪।
৩। তদেব, পৃষ্ঠা -৯।
৪। তদেব, পৃষ্ঠা -১৪।
৫। তদেব, পৃষ্ঠা -৩২।
৬। তদেব, পৃষ্ঠা -৪০।
৭। তদেব, পৃষ্ঠা -৫৬-৫৭।
৮। তদেব, পৃষ্ঠা -৬৩।
৯। তদেব, পৃষ্ঠা -৬৩-৬৪।
১০। তদেব, পৃষ্ঠা -৬৪।
১১। তদেব, পৃষ্ঠা -৮৩।

১২। তদেব, পৃষ্ঠা -৭৩।
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা -১১৩।
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা -১৪৭।
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা -১৪৭।
১৬। তদেব, পৃষ্ঠা -১৪৭-১৪৮।
১৭। তদেব, পৃষ্ঠা -১৪৮।
১৮। তদেব, পৃষ্ঠা -১৭৫।
১৯। তদেব, পৃষ্ঠা -১৯০।
২০। তদেব, পৃষ্ঠা -১৭৪।
২১। তদেব, পৃষ্ঠা -১৯৪।
২২। সিকদার অশ্রুকুমার, 'যুগলের নিঃসঙ্গতা', আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস। তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, মার্চ ২০০৩। অরুণা প্রকাশনী। কলকাতা—৬। পৃষ্ঠা—১৮।
২৩। লাহিড়ী ঝুম্পা, 'সমনামী' চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা -৯, পৃষ্ঠা - ২১৮।
২৪। তদেব, পৃষ্ঠা -২১৬।
২৫। তদেব, পৃষ্ঠা -২১৯।
২৬। তদেব, পৃষ্ঠা -২২০।
২৭। তদেব, পৃষ্ঠা -২৪১।
২৮। তদেব, পৃষ্ঠা -২৫৩।
২৯। তদেব, পৃষ্ঠা -২৬৬।
৩০। তদেব, পৃষ্ঠা -২৬৯।
৩১। তদেব, পৃষ্ঠা -২৭৯।
৩২। তদেব, পৃষ্ঠা -২৮২।
৩৩। তদেব, পৃষ্ঠা -২৭৮।

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কে.জি.টি. মহাবিদ্যালয়, বাগদগরা, দারজিলিং, পশ্চিমবঙ্গ